দৈনিক খবর
তারিখ 12 MAR 1993 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষা ও বিরাজমান সমস্যা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা

● এম আই চৌধুরী মুক্তা ●

সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজ শুরু করলেও এ ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ৬০/৭০টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাদবাকী থানাগুলোতেও পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচী সম্প্রসারণের সরকারী উদ্যোগ রয়েছে বলে শোনা গেছে। শুধু সরকারী উদ্যোগ থাকলেই চলবে না, এতে অংশগ্রহণের জন্যে জনগণের উৎসাহের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী।

সার্বজনীন সাক্ষরতার লক্ষ্যে সাবেক সরকারের আমলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ এবং প্রচারকার্য দেখা গিয়েছিল; কিন্তু ফলাফল ছিল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। প্রাথমিক শিক্ষায় পর্যাপ্তসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ না করার প্রধান কারণ দরিদ্রতা ও খাদ্যাভাব। গ্রামাঞ্চলের ৬০/৭০ ভাগ কৃষক অভাব-অনটনে জমিজমা বিক্রি করে ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় সন্তানের লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও তাদের উপায় নেই। দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা ঘুম হতে উঠেই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে খাবার অন্বেষণে বের হয়ে পড়ে। যারা কাজ পায় না তারা প্রতিবেশীর গাছের কচি ফলমূল ও বন-জঙ্গলের কচু-ঘেচু সিদ্ধ করে খেয়ে জীবন ধারণকরে।

খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না। তাই খাদ্য ও বস্ত্রের ন্যূনতম চাহিদা না মিটিয়ে এসব ছেলে-মেয়েকে স্কুলগামী করা অসম্ভব ব্যাপার। খাদ্য ও বস্ত্রের নিশ্চয়তাবিহীন অবস্থায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে। প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে সব ছাত্র-ছাত্রী ইতিপূর্বেই প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছে তাদের পক্ষেও দরিদ্রতার কারণে নিয়মিত ক্লাস করা বা লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দরিদ্র ব্যক্তি ও অল্প আয়ের লোকদের পক্ষে ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া করানো এক অসম্ভব ব্যাপার। অধিকাংশ অভিভাবকের খরচ চালানোর ক্ষমতা কমে গেছে। বই-খাতা-কলম সব কিছুরই দাম বাড়তি। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় বিনামূল্যে প্রাথমিক পুস্তক বিতরণের সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বিনামূল্যের এসব পুস্তক বিতরণে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ শোনা যায়। গত বছর কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দুই প্রকার নিয়মের কারণে বিনা মূল্যে পুস্তক না পাওয়ায় ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। রংপুর ও পঞ্চগড় জেলার ৮২ হাজার ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয়েছে। বই-পুস্তক এবং স্কুলের স্বল্পতার কারণে রংপুরের আটটি উপজেলার ৮৩টি ইউনিয়ন ও দু'টি পৌরসভার গ্রাম এবং পাড়ার ৪৫ হাজার ছেলে- মেয়ে শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত হয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। রংপুর জেলায় ৬৮৪টি সরকারী প্রাথমিক স্কুল এবং ১০৭টি বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর বর্তমান সংখ্যা চার লাখ। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ৪৫ হাজার ছেলে-মেয়ে পিতা-মাতার সংসারেও আয়-রোজগারের সঙ্গে নিয়োজিত রয়েছে। পঞ্চগড়ের পাঁচটি উপজেলায় ৩৭ হাজার শিশু পারিবারিক দরিদ্রতার কারণে নিজেদের অন্ন-বস্ত্র নিজেরাই যোগাড় করে বিধায় শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত রয়েছে।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সংগৃহীত শিশু জরিপ অনুযায়ী পঞ্চগড় জেলায় বিদ্যালয়ে যাওয়ার মত ছয় হতে দশ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা এক লাখ সাতাশ হাজার ছয়শ' বিশ। এদের মধ্যে ৯০ হাজার ৭শ' ৭৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ছে। বাকী শিশুরা পারিবারিক দরিদ্রতার কারণে স্কুলে যায় না। পঞ্চগড় জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০১টির মধ্যে ৩১০টি সরকারী। বাকীগুলো নিবন্ধনভুক্ত বেসরকারী স্কুল। দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর অবস্থা খুবই নাজুক। স্বাধীনতার পর বিশ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিছু বাড়লেও এগুলোর দৈন্যদশা আজো ঘোচেনি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু স্কুল পাকা ও আধা-পাকা করা হয়েছে। বাদবাকী স্কুলগুলো বাঁশের বেড়ার মধ্যে টিন বা ছনের ছাউনি। বন্যা ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনো মেরামত করা হয়নি। এসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে বা গাছের তলায় বসে লেখাপড়া করছে। গাইবান্ধা জেলায় ৬৬টি স্কুল ভবনকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা সত্ত্বেও মেরামত করা হচ্ছে না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এসব পরিত্যক্ত স্কুল ভবনে লেখাপড়া করছে। বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড নেই। এমনকি কোন কোন স্কুলে শিক্ষকও নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ দৈন্যদশা আদিকাল হতে চলে আসছে। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ই শিক্ষা জীবনের মূল ভিত্তি। এসব আধা-ভাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবনের প্রথম পাঠ নিয়ে যে সব ব্যক্তি পরবর্তীতে সরকারের বড় বড় কর্মকর্তা পদে আসীন হয়েছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৈন্যদশা তাদের মনেও কোন দাগ কাটে বলে মনে হয় না। তাই গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা চিরকালই অবহেলিত রয়ে গেছে।

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থা বরাবরই করুণ অবস্থায় রয়ে গেছে। মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ নির্মাণ এবং পরিচালনার নামে যাকাত, ফেতরা ও চাঁদা তুলে যুগ যুগ ধরে একশ্রেণীর লোক টাকা মেরে খাচ্ছে বলে শোনা যায়। মাদ্রাসা ও এতিমখানায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি স্কুল সিলেবাস এবং কুটির শিল্প বা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নগদ অর্থের বদলে এসব প্রতিষ্ঠানে কুটির শিল্পের সরঞ্জামাদি দান করাই শ্রেয় বলে মনে হয়। দরিদ্র, অনাথ ও মেধাহীন ছেলে-মেয়েদেরকে মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে ঠেলে দেয়া হয়। এ ধরনের মানসিকতা ও প্রবণতার পরিবর্তন হওয়া দরকার। নইলে শিক্ষার প্রসার বা অগ্রগতি সম্ভব হবে না। ২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার সরকারী ঘোষণা থাকলেও এ ঘোষণা বাস্তবায়নে বাস্তব কর্মসূচী ও কার্যক্রম খুবই শিথিল এবং হতাশাব্যঞ্জক। দশ বছর আগে আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ২৩.৮ ভাগ। এখন হয়েছে ২৪.৮২ ভাগ। এ হারে অগ্রগতি হলে আমাদের নিরক্ষরতা দূর করতে ৭৫০ বছর সময় লাগবে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া তো দূরের কথা ভাতের অভাবে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে। শহরের শিক্ষা ব্যবস্থাও ব্যয়বহুল ও জটিল হয়ে পড়েছে। ধনীর সন্তান ও দরিদ্রদের সন্তানের লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থার মধ্যে আসমান-জমিন প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জনজীবনে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। গ্রাম ও শহরের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অবিলম্বে সমতা আনতে হবে। দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে সরকার ও বেসরকারী সংগঠনগুলোকে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্য ও বস্ত্রের দায়িত্ব নিতে হবে।

বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। কোনো কোনো স্কুলে পাঁচজন শিক্ষকের স্থলে ২/৩ জন শিক্ষক স্কুল চালায়। ১৯৮৬ সালে দেশে এক হাজার নতুন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিক্ষক নিয়োগ করা হয় চার হাজার। গত বছরের মে মাস পর্যন্ত তাদের বেতন '২০৫ উন্নয়ন খাত' হতে প্রদান করা হয়। বিদেশী সাহায্যে ছয় বছর বেতন দেয়ার পর সাহায্যের অর্থ শেষ হয়ে গেছে। তাই বেতন বন্ধ হয়েছিল। সাবেক সরকার এক আদেশ বলে ১৯৮৭ সালের পর নিবন্ধিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুদান বন্ধ করে দেয়। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু স্কুল সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে অনুদান লাভ করেছে। অনুদান বঞ্চিত স্কুলগুলোর ব্যাপারে বর্তমান সরকার এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। এসব মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বেসরকারী অনেক স্কুলেই প্রাথমিক বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত আছে। তদুপরি সরকারী আদেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদেরকে বিনা বেতনে পড়ানোর পারিশ্রমিক বা ভর্তুকি এসব স্কুলকে সরকার দিচ্ছে না। এসব স্কুলকে অনুদানের আওতাভুক্ত করা হোক, অন্যথায় নিবন্ধন বাতিল করে দেয়া হোক।

সরকার ঘোষিত নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রদান, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার, শিক্ষকদের পদোন্নতি ও উচ্চতর বেতন স্কেলসহ বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আহবানে দেশের বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের ৩৫ দিনব্যাপী অবিরাম ধর্মঘট পালিত হয়েছে গত বছর। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দাবী মেনে নেয়ার ঘোষণার প্রেক্ষিতে ধর্মঘটের অবসান হয়। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গভীর ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের শিকার। ছাত্র রাজনীতির নামে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্য বন্দুক যুদ্ধে প্রায়ই ছাত্র মারা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব না হলে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ মহাঅনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে- এতে কোন সন্দেহ নেই।